সম্বাদটি অপ্রকাশিত

অরুন্ধতী ভট্টাচার্য্য

ধুলো ঘাটতে ভীষণ কষ্ট হয় অদিতির। তবু আজ একরাশ ধুলো ঘেঁটে তাকে পুরোহিত দর্পনের নিয়ম লেখা ঠাকুরদার আমলের নীল খাতাটা খুঁজে বার করতেই হবে। এ বাড়ির বড়ো কর্তা শ্রীমাধবনাথ রায়ের আদেশ অমান্য করার সাহস এখনও বাড়িতে কারোর নেই। পঁয়তাল্লিশের কোঠায় পা দেওয়া অদিতির আজও জেঠু মাধবরায়ের কাছে দুই বেনী বাঁধা চোদ্দ বছরের খুকিই রয়ে গেছে — অন্তত: পঁচাশি বছরের শ্রীমাধবনাথ তা-ই মনে করেন। কাছেই বাধ্য খুকি হয়ে দায়িত্ব পালন করে চলেছে অদিতি। নাকে রুমাল বেঁধে সেই সকাল থেকে সম্ভাব্য সমস্ত জায়গাতেই খুঁজে হাঁফিয়ে উঠেছে। ভাইঝির অকর্মন্যতা ও নিষ্ঠাহীনতায় যে প্রবল ক্ষুব্ধ হচ্ছে মাধবরায় তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সে। জ্যেঠুর মধুর বাক্যবাণ শুনে, একটা চা-জলখাবারের বিশ্রাম পেয়েছে অদিতি। চায়ের কাপটা নিয়ে মায়ের ঘরেই বসেছিল সে। মার ঘরের সামনে একটা লাগোয়া ছোটো ছাদ। মার বাগান করার সখ ছিল খুব— খুব সুন্দর সুন্দর রং - বেরঙের ফুল ফুটত সেখানে। মা মারা যাবার পর যেন একটু দ্রুতই নষ্ট হয়ে গেল বাগানটা। এখন কয়েকটা তুলসী, নয়নতারা ছাড়া আর কিছুই প্রায় নেই। বাগান থেকে বড়দাকে হঠাৎ ঘরে ঢুকতে দেখে চমকেই উঠেছিল। বড়দাও বোধহয় তাকে এঘরে দেখবে আশা করেনি। বড়দার মধ্যে একটা অদ্ভুত স্নেহ - আছে। একটু উদাস গলায় বলে উঠল—

—হাঁফিয়ে গেছিস, নারে? খুঁজে পেলি আমাদের শ্রেষ্ঠ পূর্বপুরুষ শ্রীরাধানাথ রায়ের নীল খাতাটা?

— না:। চা টা শেষ করে আবার খুঁজব।

— সাত - সাতটা বছর হয়ে গেল, ছোটোমার মৃত্যুর!

— বছরের হিসেব তা-ই বলে বড়দা! তবে কী জান, এখন কেন যেন মনে হয় মা বোধহয় সে অর্থে বাঁচা অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। বছর বছর মার মৃত্যু তিথিতে এই আয়োজন আর ভালো লাগে না!

বড়দার সঙ্গে কথা বলে একটু ভালো লাগে। কিন্তু সে আর হলো না। শ্রীমাধবরায়ের খড়মের শব্দে কোনো রকমে চা শেষ করল অদিতি, বড়দা বাগানে গা ঢাকা দিল। পুরোনো দিনের বিশাল বনেদী বাড়ির মধ্যে থেকে ঠাকুরদার নীল খাতা খোঁজা খুব সোজা নয়। কেন যে এরা খাতাটা নিজেদের কাছে রাখে না। যত্তসব ঝামেলা! ঠাকুরদা শ্রীরাধানাথ রায়ের ঘরটা এখন অদিতির গন্তব্য। সে ঘরের চাবি জ্যেঠুর কাছ থেকে চেয়ে বহুকাল পর ঘরটাতে ঢুকলো অদিতি। ঘরটি যে বনেদীয়ানা হারিয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বহুকাল পরিষ্কার হয়নি - একটা দমবন্ধ করা গন্ধ! ঘরটা যে একটু পরিষ্কার করে খাতা খোঁজার মহৎ কাজে নিজেকে উৎসর্গ করবে, তারও উপায় নেই— তাড়া আসছে ক্রমাগত! সত্যি, মা কী করে যে এই শ্বশুরবাড়িতে ঘর করেছিল! দাদা কী সাধে আসে না এদের ভণ্ডামিতে। বড়দা এই বাড়াবাড়িটাকে একটু রাশ টানতে চেয়েছিল, উত্তরে শুনল।

—''পরেশ, তুমি খুকির বড়দা হতে পার, এই বাড়ির নও।''

ব্যাস সব চুপ। অকারণ খাটুনিটা অদিতির কপালে জুটেই রইল।

অনেক কষ্টে ঠাকুরদার মান্ধাতা আমলে ট্রাংকটা খুলেছে অদিতি। একদিকে গুচ্ছের পুরনো কাগজের স্তূপ, অন্যদিকে দলিল - দস্তাবেজ গোছের কিছু বান্ডিলের নীচে উঁকি মারছে শ্রী রাধানাথ রায়ের বিখ্যাত নীল খাতার কোনাটা! মার মৃত্যু তিথিতে এবার নাকি এ খাতাটা অপরিহার্য। কেন কে জানে বাবা! বড়দা একবার হেসে বলেছিল—

—ছোটোমার কাছে বোধ হয়, ক্ষমা - টমা চাইতে লাগবে খাতাটা — কে জানে? এবছরই গয়া পিণ্ডদান হবে বলে শুনছিলাম! সংস্কৃতটা ভালো বুঝি না রে খুকি!

ভেতরে ভেতরে বেশ রাগ হচ্ছিল অদিতির। লোকে বলে না, 'মরলে পরে শীতল পাটি?... সারাটা জীবন মহিলার হাড়মাস কালি করল, এখন ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে— আদিখ্যেতা। মার মৃত্যুর ছবিটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল অদিতি। মৃত্যুটা হঠাৎ করেই হয়েছিল। বাবা শুধু নামেই ডাক্তার। তাই - কিছু করার আগেই সব শেষ হয়ে যায় একটা রাত্রির কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে! বাবাকে জ্ঞানত খুব স্বাভাবিক দেখেনি অদিতি। মার মৃত্যুও বাবার মধ্যে বিশেষ কোনও পরিবর্তন আনল না... শুধু মা মারা যাবার মুহূর্তে অস্ফুট স্বরে বাবার মুখ থেকে আশ্চর্য একটা কথা শুনেছিল সে— 'প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমায়...'! ঘটনাক্রমে অদিতি বাবার খুব কাছে ছিল বলেই সম্ভবত: কথাটা সে ছাড়া আর কেউ শোনেনি।

একটু অন্যমনস্ক হয়েই জিনিসগুলো নাড়া - চাড়া করছিল সে। কেন যে লোকে গুচ্ছের পুরোনো কাগজ জমিয়ে রাখে! কোনো কাজেও লাগে না অথচ জমিয়ে রাখা চাই! বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে কাগজের বান্ডিল, পুরনো দলিল তুলে পাশে রাখছিল অদিতি, তখনই খামটার দিকে চোখ পড়ল! লম্বা খাম, বেশ একটু হলদেটে হয়ে যাওয়া একটা চিঠির খাম! ওপরে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আছে মায়ের নাম — শ্রীমতি আশালতা রায়'— আর সবচেয়ে চমকপ্রদ প্রেরকের নাম — শ্রী ব্যোমকেশ বক্সী'! অদিতি হাঁ করে খামটার দিকে তাকিয়েছিল— চোখের ভুল নয় তো! এও কখনও সম্ভব! অদিতি খামটা হাতে নিয়েই বুঝল বেশ কয়েক পাতার চিঠি — খামটা একটু বেশিই ভারি

— কী হলো, খাতা পাওয়া গেল?

চট্ করে খামটা আঁচলে ঢেকে জ্যেঠুর দিকে তাকিয়ে কেটু হাসল অদিতি। নীল খাতাটা অতি সাবধানে জ্যেঠুর হাতে দিয়ে বলল,

—জ্যেঠু ঘরটার অবস্থা খুব খারাপ। আমি একটু গুছিয়ে দিই, কেমন?

সম্মতি জানিয়ে মাধবনাথ খাতাটার পাতা সাবধানে ওল্টাতে ওল্টাতে চলে গেলেন। একটু দম নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে অদিতি। পারতপক্ষে সেঅন্যের চিঠি পড়ে না, তা সে যত আপনজনই হোক কিন্তু এক্ষেত্রে কৌতুহলটা চেপে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কয়েকটা বিষয়ে প্রথম থেকেই খটকা লাগছে — প্রথমত! চিঠিটা বোধহয় ইচ্ছে করেই এখানে রাখা যাতে কারও নজরে না পড়ে। দ্বিতীয়, খামে

সৃষ্টিসন্ধান

ডাকটিকিট বা ঠিকানা কোনোটাই নেই— তার মানে চিঠিটা হাতে হাতে দেওয়া হতে পারে। আর খামের ওপরের হাতের লেখাটা তার কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে!

খামের মুখে আঠার দাগটা পুরনো হয়ে গেছে। খুব সাবধানে চিঠিটা বার করল অদিতি। বাপ্‌রে, এতো প্রায় একটা খাতা। নিজের ভেতরে একটা শিরশিরে ভাব অনুভব করছিল সে। চিঠিটার শুরুতে কোনো চিরাচরিত সম্বোধন নেই। প্রথম পাতার ওপরের একটা অংশকে ইচ্ছে করেই যেন অস্পষ্ট করা হয়েছে— বোধহয় তারিখ। জানলা দিয়ে গড়িয়ে আসা রোদের দিকে পাতাটা তুলে, উল্টো পৃষ্ঠার ওপর ওইখানেই আলতো তর্জনি বুলিয়ে... অদিতির কেমন যেন মনে হলো '২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩' লেখা ছিল। মানে! মার মৃত্যুর ঠিক দুদিন আগের লেখা চিঠি আর দেরি না করে রুদ্ধশ্বাসে অদিতি চিঠিটা পড়তে শুরু করল—

''আশালতা,

তোমাকে একটা খবর দেব বলেই চিঠিটা লিখছি। জানত, বহু কথা মুখে বলে বোঝান যায় না, আবার না বলেও থাকা যায় না। আমার চিঠি লেখার বিশেষ অভ্যেস নেই, তাই বক্তব্যগুলো কিঞ্চিৎ অগোছালো হতে পারে। আমি একটি বিশেষ বিষয়ে বোধহয় সাফল্য পেয়েছি— সত্যান্বেষণে। এবং সে সত্য তোমার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে ছড়িয়ে আছে বলেই আমার ধারনা। সেই সত্যই তোমার সামনে তুলে ধরছি, কোথাও ভুল হলে সংশোধন করে দিও— অবশ্যই যদি তোমার ইচ্ছে হয়।

বহুবছর আগেকার কথা— তুমি তোমার শ্বশুরকুলের সঙ্গে একবার পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলে— স্থানের নাম উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তোমরা একটি ভাড়াবাড়িতে উঠেছিলে। তোমার শ্বশুর, শ্রীরাধানাথ রায়, অতিরিক্ত মাত্রায় রক্ষণশীল। তাই হোটেল নামক 'ম্লেচ্ছ' স্থানে তোমার শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও থাকা হলো না। তোমার জীবনে ইচ্ছে বস্তুটা বড্ড শক্ত - পোক্ত - পূরণ হতো না — জ্বালা হতো। তবে তোমরা যে বাড়িটিতে উঠেছিলে সেটি নেহাৎ মন্দ ছিল না। সামনে ফুলের বাগান, বিচিত্র গাছ - গাছালিতে ঘেরা ভারি স্নিগ্ধ একটি পরিবেশ। তোমার গাছপালা, ফুল - লতাপাতা চিরকালই খুব ভালো লাগে, তাই হোটেল নামক কেতাদুরস্ত স্থানের মোহ সহজেই কেটে গেল। তোমার দুটি সন্তান তখন নেহাতই শিশু। মেয়েটি বছরখানেকের আর পুত্রটি বছর পাঁচেকের হবে। তোমার পরিবারে লোকের অভাব ছিল না— তোমার ভাসুর শ্রীমাধব রায়, জা কমলিকা এবং তাদের তিন পুত্র পরেশ, রমেশ, ব্রজেশ। তোমার সেই ভ্রমণে তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সজলও সঙ্গী হয়েছিল আর সঙ্গে ছিল। তোমার এই ননদটির প্রতি তোমার শ্বশুর ও স্বামী ভিন্ন কেউ-ই বিশেষ সদয় ছিল না। অথচ তার মতো নিতান্তই সাধারণ গোবেচারা ধরনের পোষ্য প্রাণী তোমার সংসারে আর কেউ ছিল বলে তোমার মনে হতো না। তবুও তোমার শাশুড়ি শ্রীমতি করুণাময়ী দেবী তাকে প্রখর বাক্যবাণে জর্জরিত না করে এক দিনও জলস্পর্শ করতেন কিনা সন্দেহ আছে তবে তোমার ননদটির সহিষ্ণুতা ছিল। তার নামটি সে যুগের তুলনায় বেশ আধুনিক ও অর্থবহ ছিল— অনামিকা রায়, আশা করি এই বক্তব্যের গূঢ়ার্থ তুমি বুঝেছ। সত্যান্বষণে তা কীভাবে সাহায্য করল তা যথা সময়ে উল্লেখ করব।

যাই হোক, এই শ্বশুরকুলে অনামিকাই তোমার সঙ্গী ছিল। বাড়ির ছোটো বউ হবার সুবাদে বাড়ির মধ্যে তোমার যা ভূমিকা ছিল, বেড়াতে এসেও তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটলনা। তোমার পরিবরের ভ্রমণ - বিহারের থেকে বিশ্রাম - আহারের বহরটাই বড়ো বেশি ছিল। ফলে ছেলে সামলান থেকে রকমারি ফরমায়েসী রান্না, সবার বাহারি কাপড় জামার পরিপাট্য বজায় রাখা, ইত্যাদি চিরকালের মতো তোমারই দায়িত্বাধীন ছিল। অনামিকা তোমার বহু দায়িত্ব লাঘব করার চেষ্টা করত, কিন্তু তুমিই দিতে না, ভারি মিষ্টি হেসে সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে— 'নিজের সংসারে কোরো, কেমন?' স্বল্পভাষায় একটুও আঘাত না করে নিজের অধিকারের গন্ডিটায় তুমি তাকে ঢুকতে দিতে না। অথচ সে তোমার সখ্যতায় নিজেকে ধন্য মনে করত। যদিও তুমি জানতে অনামিকার এই কৃতজ্ঞতায় একটা স্বার্থ ছিল। তা স্বার্থ কার না থাকে? তোমারই কী ছিল না?

বেড়াতে এসে তোমাদের ননদ - ভাজের সখ্যতা বাড়ির কারের কারোর চোখে বেশ বেমানান লাগতে লাগল। এমনকী তোমার শান্ত শিষ্ট ডাক্তার স্বামীটিও একদিন এ বিষয়ে মস্করা করে ফেললেন। অবসর সময়ে বাড়ির সবাই যখন বেড়াতে যেত, খুকি ঘুমাত, তখন তুমি আর অনমিকা বাগানটায় ঘুরে বেড়াতে। এটুকুই তোমার অবসর ছিল— অথবা কাজের সময়' হয়ত খেয়াল করতে না, বাড়িতে তখন আর একজনও থাকত। পাহাড়ের সৌন্দর্য অপেক্ষা বইপত্রই তাকে বেশি আপন করে নিয়েছিল। তোমাদের দুই সখীর বাগান বিহার সে লক্ষ্য করেছিল কিন্তু তখনও কিছু ভাবেনি। তার ভাবনা শুরু হয়েছিল সজলের সঙ্গে বন্ধুত্বটা বেশ পাকাপোক্ত হবার পর। এখানে বলে রাখি, তোমার বিবাহ পূর্ব জীবনের বেশ কিছু তথ্য সজলের কাছ থেকেই জানা গেছিল। তবে তার ওপর রাগ করোনা— সে নিতান্ত গল্পচ্ছলেই কথাগুলো বলেছিলো— কথার পিঠে কথা জুড়ে, অনুষঙ্গ থেকে প্রসঙ্গে আসার কাজটি সত্যান্বেষীর। সজল বেচারা জানেও না, সে কী ব্রহ্মবান তুলে দিয়েছিল তার 'লতাদির'র অমলির চরিত্র ব্যাখ্যায়।

তোমার নামটি রাবীন্দ্রিক এবং রবীন্দ্র ব্যঞ্জনাগর্ভ। আশালতার একটি পত্রও তার নিজের মতো মুকুলিত হতে পারেনি, সেই শৈশবকাল পরিবারের সব দায়িত্বই পালন করতে— বিবাহ - উত্তর জীবনে কোন এক বেহিসেবী যুক্তিতে পরিবারের কনিষ্ঠা বধূ হিসেবেও দায়িত্ব ছিল না। তোমার কিছু বিচিত্র স্বভাব বৈশিষ্ট্য ছিল। অসম্ভব স্বল্পভাষী হয়েও তুমি মানুষের মনের কথা শোনার সবচেয়ে উপযুক্ত এবং প্রায় অদ্ভুত সব পন্থা নিতে। তথাকথিত সাংসারিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়েই তুমি তোমার জ্ঞান ও কৌতূহলের তৃষ্ণাটি অক্ষত রেখেছিলে। ঠোঙা থেকে শুরু করে স্বামীর ডাক্তারি বই - এরপর দুর্বোধ্য পিতার অবদান উল্লেখ না করলে তাঁকে অশ্রদ্ধা করা হয়। তিনিই তোমার মধ্যে জ্ঞান - আহরণ, কৌতূহল নিবৃত্তি আর বুদ্ধির সংযমী প্রয়োগের বীজটি রোপন করেছিলেন। কেবল বাক, চাতুর্যের অসধারণ দক্ষতাটি তোমার মৌলিক বৈশিষ্ট্য বা জীবনই তোমায় শিখিয়েছিল।

শ্রীরাধানাথ রায়ের ডাক্তার পুত্রের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ স্থির হয়।' পাত্রীদেখা পর্বে তোমায় সাদা কাগজে কিছু লিখে দেবার আদেশ হলে, তুমি লজ্জানত মুখে মুক্তাক্ষরে ইংরেজীতে বেশ কয়েক ছত্র লিখে দিলে। যদি খুব ভুল না করে থাকি তাহলে বলা যায় হাতের লেখা দেখার রীতিটি সম্পর্কে তোমার অস্পষ্ট হলেও যুক্তিসঙ্গত ধারনা ছিল। অপর আরেকটি কারণ বোধহয় শ্রীরাধানাথ রায়ের দম্ভকে একটু আচঁড় দিতে চেয়েছিলে, যাতে সম্বন্ধটা বিয়ে পর্যন্ত না গড়ায়। কিন্তু তোমার সে চেষ্টা ব্যর্থ করল তোমার রূপ। শ্রীরাধানাথ রায়ের ডাক্তার পুত্রের সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়ে গেল।

আবার ফিরে আসি তোমার পর্বত ভ্রমণের কাহিনীটিতেই। সেকালে মানুষের একমাসের অবসর ভ্রমণ আজকের যুগের মতো অসম্ভব ছিল না। বিশেষত: তোমার শ্বশুরকুলের মতো অবস্থাপন্ন বনেদী পরিবারের পক্ষে সেটাই আভিজাত্যের গৌরব ছিল।

সৃষ্টিসন্ধান

তোমাদের ভ্রমণের সময়কালও সেরকমই প্রলম্বিত ছিল। এক সপ্তাহ কাটাবার পর তোমার অভ্যস্ত হাত উনুন ধরাতে আয়োজন সকাল থেকেই শুরু হতো, সেদিনও তা-ই হচ্ছিল। তখনই বাড়ির সদর দরজার সামনে একটি গাড়ি এসে থামে। নেমে আসেন একজন সুপুরুষ, বয়স আন্দাজ তিরিশ হবে। ভদ্রলোক প্রথম দিনও এসেছিলেন, সেদিন তুমি তাঁকে দেখেছিলে, তিনি তোমায় বোধ করি দেখেননি। তাই সেইকালে তোমাকে দেখে চমকে ওঠেন। কিন্তু তুমি সাবেকী গৃহবধূর সম্ভ্রম রাখতে ঘোমটায় নিজেকে আড়াল করে অন্দরমহলে চলে গেলে। এই সমস্ত কিছুই সবার অলক্ষ্যে একজন দেখে যাচ্ছিল — যা তোমরা কেউই দেখনি। যাই হোক, আগন্তুক মানুষটির আপ্যায়ণের দায়িত্ব তোমার ওপরই ছিল, আর সে দায়িত্ব তুমি নিজেই নিজেকে দিয়েছিলে, ভদ্রলোকের নাম শ্রীবিমোহন ঘোষাল। তোমরা যে বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলে তিনি সেই বাড়িরই মালিক এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় দুটি হোটেলের মালিকানাও তাঁর ছিল। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, এই বাড়িটি বিমোহনের মাতামহের এবং তিনিই এটির একমাত্র উত্তরাধিকারী। সেদিন তোমার কাজের মধ্যে পরিপাট্য এত বেশি ছিল যে তোমার অতিবড়ো নিন্দুক জা কমলিকা দেবীও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শুধু মুগ্ধ হলো না একজন। অনামিকাকে দেখতে মন্দ ছিল না, কিন্তু অদ্ভুত একটা বিষণ্ণতা তার মুখটিকে ঘিরে থাকত। সেদিন অনামিকাকে নিজের হাতে সাজিয়ে যখন জোর করেই চা - জলখাবার হাতে সবার সামনে নিয়ে আসলে, তখন তাকে দেখে কারো মুখে কথা ফুটল না। নিজের রূপটুকুর সঙ্গে কী মোহময় স্নেহ মিশিয়ে তাকে সাজিয়েছিলে সেদিন! বিমোহনের মুগ্ধ দৃষ্টি অনামিকার মুখমন্ডলে ঘোরাফেরা করতে লাগল— সে দৃষ্টির মধ্যে একটা ব্যাকুলতা ছিল, যা তুমি ছাড়া আর কেউ চিনতে পারেনি। বোধহয় তা সম্ভব ছিল না।

বিমোহনের সঙ্গে সজলের আলাপচারিতায় বোঝা গেল, সে তোমার পিতৃকূলের পরিচিত। তোমার কার্যকরী স্বল্প ভাষার দক্ষতায় বাড়ির গুরুজনদের কাছে অনামিকা - বিমোহনের বৈবাহিক সম্বন্ধের প্রস্তাবটি দিলেন— তুমি জানতে এ প্রস্তাব নাকচ হবার সম্ভাবনা কম। এরপর যখন রাধানাথ রায় ও মাধবরায়ও রাজী হলেন তখন আর কোনো অসুবিধাই রইল না, আর যে অসুবিধা অগোচরে ধরা পড়ল তা তোমার জানা ছিল! অনামিকার মুখের মধ্যে সর্বক্ষণ একটা ত্রস্তভাব দেখা যেতে লাগল। সবাই ভাবলে, বিয়ে ঠিক হলে সব মেয়েদেরই এমন ভয় করে। ইতিমধ্যে বিমোহনের পিতার সঙ্গে তার ও চিঠি মারফৎ বিবাহ প্রস্তাব মঞ্জুর হয়ে গেছে। তাঁরা কলকাতায় তোমাদের বাড়িতে পাকা কথা বলতে আসবেন বলে জানালেন।

এমনই একরাতে সবার অলক্ষ্যে একজনের নজরে একটি ঘটনা ঘটল, শুধু চক্ষুই নয় কিছু কথা তার কর্ণগোচর হলো। তোমার ঘর থেকে কান্নায় আলুথালু হয়ে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। অন্ধকার বারান্দায় এক কোনায় দাঁড়িয়ে স্খলিত স্বরে সে বলতে লাগল—

—''আমি কিছুতেই এই বিয়ে করতে পারব না।''

—সে টের পায়নি কখন তুমি নীচের রান্না ঘরের কাজ সেরে ওপরে এসে ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়েছ। তোমার হাতে ছোঁয়ায় সে চমকে উঠে তোমাকেই জড়িয়ে ধরল। তুমি শুধু তার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলে।

এদিকে শ্রীমান বিমোহনের যাতায়াত প্রায় নিয়মিতই হয়ে এসেছিল। উক্ত ঘটনার পরের দিন অনামিকার সঙ্গে বিমোহনের একান্তে কথা বলার আয়োজনেও তুমি বেশ বুদ্ধির পরিচয় দিলে। জা - শাশুড়ি ইত্যাদিকে স্বল্পভাষাতেই হঠাৎই যেন আধুনিকমনস্ক করে ফেললে। শুধু তোমার শান্ত - শিষ্ট স্বামীটি কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল। সারাদিন বাড়ির বাইরেই থাকত। কিছু জিজ্ঞেস করলে ডাক্তারি সংকল্পের কথা শোনাতে লাগলো। এই সমস্ত কিছুই তোমার ধারনার আয়ত্তে ছিল। এখন ধারনা থেকে সিদ্ধান্তে স্থির হলো। দীরে ধীরে বিমোহনের মুখে একটি বিরহকাতর প্রেমিকের ছায়া ঘনায়মান হতে লাগল। এই ছায়া ছায়া খেলা তোমাদের অলক্ষ্যে আর একজন লক্ষ্য করে যাচ্ছিল।

এমনই এক বিশৃঙ্খল সন্ধ্যেবেলায় তুমি একান্তমনে খুকিকে দুধ খাওয়াচ্ছিলে। বাড়ির কেউ কেউ সান্ধ্যভ্রমণে বেড়িয়েছে। হঠাৎ-ই তোমার ভাসুরের বড়ো পুত্র পরেশ তোমার কাছে এসে বসে পড়লে। বয়সে সে তোমার থেকে বছর পাঁচেকের ছোটো, তবে সম্পর্কে পুত্রবৎ। তুমি একটু চমকেই উঠেছিলে তার কথায়। তোমার মুখের ভাব দেখে সে অদ্ভুত হেসে বলেছিল—

—ছোটোমা তুমি হঠাৎ 'অমিতির বিয়ের জন্য পাগল হলে কেন?

— এ আবার কী! বিয়ের বয়স হচ্ছে, বিয়ে দেব না। আর তোরই বা এত ডেঁপোমির কী দরকার?

বেচারা পরেশ বকা খেয়ে উঠেই যাচ্ছিল, কিন্তু তুমিই তাকে কাজের অছিলায় বসিয়ে রাখলে, খুকিকে তার কোলে দিয়ে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—

—তোদের ডাকগুলো যেন কেমন? 'অপিসি' আবার কী?

— পিসি হলে তো পিসি ডাকব।

— তোর কিন্তু খুব বাড় বেড়েছে। হ্যাঁরে সজলকে দেখছি না, কোথায় জানিস?

— সঠিক জানি না। তবে বোধহয় অপিসির কাছ থেকে কী একটা নিয়ে বেরোল। আচ্ছা ছোটোমা, তুমি এই গাছ - লতা - পাতার নাম জান?

— না।

আশালতা, তুমি তোমার শ্বশুরকুলের কলঙ্গিত অধ্যায়টি জানতে। - জানতে শ্রীরাধানাথ রায়ের রক্ষণশীল বনেদিয়ানার নেপথ্যে একটি কালো পর্দাও ছিল। অনামিকা রাধানাথের রক্ষিতার সন্তান। সম্ভবত অনামিকাকে জন্ম দিয়েই রক্ষিতাটি মারা যান। তোমার ছেলে জন্মানোর পর একদিন রাধানাথ অনামিকাকে পাকাপাকি ভাবে বাড়িতে নিয়ে আসে। এর আগে সে হোস্টেলে থাকত। এই পর্যন্ত সমস্ত ঠিক ছিল। তোমারও বিশেষ বিরাগ ছিল না অনামিকার প্রতি। যদিও তোমার শাশুড়ির আক্রোশ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তোমার অজানা অধ্যায়গুলো তোমায় জানিয়ে দিলে। তোমার বড়ো জা কমলিকা সংযোজন অতিরঞ্জন দিয়ে প্রায় কিছুই বাকি রাখল না তখন থেকেই তোমার মনে খটকাটা লাগতে শুরু করে। কোনো কিন্তু এই গোপন কথাটি তোমার স্বামীর ডাক্তারি খাতার কয়েকটি পাতা তোমায় বলে দিল— ইংরেজী হরফে বাংলায় লেখা সুদীর্ঘ অনুভূতিমালা।

কৌতূহল ও বুদ্ধি দুটিই তোমার সুচারুভাবে ঢাকা থাকত দায়িত্ব পালনের নৈপুন্যের মধ্যে দিয়ে। তুমি জানতে অনামিকা বাড়ির

সৃষ্টিসন্ধান

মধ্যে তোমার কাছেই এক নিঃশ্বাস নিতে পারত। তুমি নিজে কিছুই জিজ্ঞেস করতে না— কিন্তু প্রশ্ন না করে কীভাবে কৌতূহল মেটাতে হয় তা তুমি জানতে। শ্রীরাধানাথ রায় তাঁর এই অবৈধ সন্তানটিকে তৎকালীন সময়েও পড়াশোনা শিখিয়েছিলেন, তাও বিজ্ঞান শিক্ষা। অনামিকার ভূতপূর্ব হোস্টেল আর তোমার স্বামীর হাসপাতালটি যে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ, তা তুমি সহজেই জেনে নিলে। আগেই বলেছি কিছু অদ্ভুতুড়ে বিষয়ে তোমার সীমাহীন আগ্রহ ছিল। তুমি নিজের আগ্রহ চরিতার্থ করতেই এগোলে, কিন্তু তাতে দেখলে তোমারই গ্রহদশা মন্দ। এরপর কপট সহমর্মী মানবিকতায় কথাচ্ছলে তোমার স্বামীকে বললে অনামিকাকে নার্সিং এর ট্রেনিং দেওয়ানোর বন্দোবস্ত করতে। তীর নিশানায় লাগল। অনামিকার সঙ্গে তোমার স্বামীর অবাধ মেলামেশা করার সুযোগ করে দিলে। সত্যি। নারী মনস্তত্ত্ব বড়ো জটিল। যেমন অনামিকা কেন বিমোহনকে বিয়ে করতে চায় না, তা তুমি জানতে। কিন্তু অনামিকা বুঝল তার প্রণয় - পিয়াসী কেউ আছে এবং সে সম্পর্কে তোমার কোনো আগ্রহ নেই। আমার বুদ্ধি বলে অনামিকাকে চিঠির মাধ্যমে বিমোহনকে সবকথা বলার সৎ সাহসের পরামর্শটি তুমিই দিয়েছিলে, যদিও চিঠিতে বক্তব্য অনামিকার ব্যক্তিগত ব্যাপার— এমনটাই বুঝিয়েছিলে। পরেশকে সজলের কথা জিজ্ঞেস করে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলে তোমার পরিকল্পনা সঠিক পথে এগোচ্ছে কিনা তা জানার জন্য। ছোবল তুমি মারতেই, অপেক্ষায় ছিলে। পর্বতভ্রমণে এসে এমন সুবর্ণসুযোগ আসবে তা তুমি ভাবতে পারনি। হয়ত সে কারনেই তোমার পদক্ষেপগুলি একটু বেশিই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

এখানে তোমার বিবাহ - পূর্ব জীবনের কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করা অপরিহার্য। তথ্যাংশ গল্পচ্ছলে সজল বলেছিল, তার কোনো উদ্দেশ্য বাপের বাড়ির সংলগ্ন ছিল বিখ্যাত কবিরাজ পরশমনি হালদারের বাড়ি। সেখানে তোমার অবাধ যাতায়াত ছিল। বিশেষত: গ্রীষ্মের ছুটি, পূজোর ছুটিতে কবিরাজের দৌহিত্র বিমোহন যখন আসত। বিমোহন তোমার রূপে হয়ত মুগ্ধ ছিল, কিন্তু প্রেমিক হয়ে ওঠার সাহস তার ছিল না। কবিরাজ পরশমণি হালদারের বাড়ি থেকে যৌবনের প্রথম বসন্ত স্পর্শ ছাড়াও তুমি আর একটা জিনিস শিখেছিলে। মুগ্ধ বিমোহনকে প্রেমিক করলে অনামিকাকে দিয়ে। অনামিকা বিমোহন কেউ টেরও পেল না তুমি তোমার বঞ্চনার প্রতিশোধ নিয়ে নিলে। অনামিকার লেখা চিঠি বিমোহন সহ্য করতে পারবে না, তুমি জানতে। বিমোহন অপমানের যন্ত্রণা বাড়ি বয়ে দংশন করে গেল প্রায় সবাইকে। অনামিকার মনস্তত্ত্ব তোমার কাছে তখন জলের মতো পরিষ্কার। এরপর দিনই কোনো এক অজ্ঞাত বিষ খেয়ে অনামিকা আত্মহত্যা করল। তোমার শান্তশিষ্ট স্বামীটি সম্ভবত ওই একদিনই উগ্র হয়ে উঠেছিল। এরপর থেকে তার এক বিচিত্র অসুখ দেখে দিল— অ্যালজাইমার। খুব ধীরে ধীরে বিশৃঙ্খল হতে লাগল তাঁর স্মরণশক্তি। আর প্রেমিক বিমোহন হাড়ে হাড়ে টের পেতে লাগল পুড়লে কতটা জ্বালা হয়। বিশেষত যখন পোড়ার কারনটা পুরোপুরি জানা হয়ে যায়। অনামিকার পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গিয়েছিল কোনো এক গাছের পাতার বিষাক্ত নির্যাস মৃত্যুর কারণ— অথচ সেই গাছেরই ফলের বীজ প্রাণদায়ী ওষুধ তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। বেচারি অনামিকা তোমার সঙ্গে সান্ধ্যকালীন বাগান ভ্রমণের ফল হাতে নাতে পেয়ে গেল।

তোমার স্বামীর প্রাণটি তোমার বড়ো প্রিয় ছিল— শত্রু ছিল তার অনামিকার স্মৃতি বিজড়িত মনটি। কোন বিস্ময়কর উপায়ে ভেষজের বিচিত্র ব্যবহারে তাঁর স্মৃতিকে তুমি শেষ করলে তা আজও ভেবে পাই না। এমন এক লতা, যার শিকড়ের রসের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার মানুষের মানুষের স্মৃতিশক্তিকে খুব ধীরে ধীরে শেষ করে দেয়। অথচ ডাক্তারি পরীক্ষায় কেবলমাত্র স্নায়বিক বৈকল্য ব্যতীত আর কিছুই ধরা পড়ে না। তোমার স্বামীকে বাড়ি ফেরার পর ডাক্তার দেখান হয়, ফল বিশেষ কিছু হয় না। এ ভাবেই বেশ কয়েকবছর কেটে যায়। হঠাৎ মাধবনাথ কোথা থেকে এক ছোকরা ডাক্তার ধরে আনলেন। সে বিচিত্র পদ্ধতিতে চিকিৎসা শুরু করল। বেশ কিছুদিন চিকিৎসা চলার পর হঠাৎ একদিন তোমার স্বামী কেঁদে উঠলেন! তুমি তোমার ঘরের লাগোয়া ছাদের বাগানটিতে ছিলে। কান্না শুনে ছুটে এলে— দেখলে, তোমার স্বামীর হাতে একটি কলম গুঁজে দিয়েছে, সামনে একটি সাদাপাতা— তোমার স্বামী শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে সাদা কাগজে লিখলেন — 'অনামিকা'!

এর মাসখানের পরেই তোমার স্বামীর আরোগ্য লাভের মানত হিসেবে বাড়িতে যজ্ঞ হলো। কেউ টেরও পেল না, একটি লতা ছাড়া তোমার হাতের গুণের অপরূপ ফুলের ঝাড়ের ভেতর থেকে সমস্ত ভেষজ সেই যজ্ঞাগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

আমি সবটাই জানি বা আন্দাজ করছি। তোমার ফুলের বাগানেও পরশমনি কবিরাজ ঘাপটি মেরে ছিল — যার হয়ত আর একটি কাজই বাকি আছে! এবার বোধহয় পরশমণি তুমি ছোঁবে নিজের জন্য। একটি লতার পাতাগুলো ছাড়া সবই তো আহুতি দিলে, তবু বলি, সেদিন যদি আমায় 'ডেঁপো' বলে না বকে ভেষজগুলোর নাম বলতে, কতো ভালো কাজে লাগতে পারতাম!

ইতি—

(ছদ্মনামে)

শ্রী ব্যোমকেশ বক্সী"

সৃষ্টিসন্ধান